আল সাাদি

বিকেল চারটা। আকাশ গম্ভীর, বাতাস বেপরোয়া। হঠাৎ করে নামল ঝড়—প্রচণ্ড বৃষ্টি আর বিদ্যুতের ঝলকানিতে কেঁপে উঠল গোটা আকাশ। মনে হচ্ছিল, আকাশটাই যেন ফেটে যাবে। বিদ্যুৎ চমকাতে চমকাতে ৪০ মিনিট পর সব কিছু আবার স্তব্ধ। তবে সেই ঝড় যেন রেখে গেল এক অনন্ত অন্ধকার।

বাড়ির সব ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছে। সময় তখন রাত ৯টা। আগে যখন বিদ্যুৎ যেত, তখন পুরো বাড়ি যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠত—গল্পগুজব, মোমবাতির আলোয় চায়ের কাপ। এখন যেন কিছুই আর থাকে না। বাড়ির মানুষগুলো কেমন যেন একেকজন একেক ঘরে গুটিয়ে গেছে। সেই প্রাণভরা বাড়ি যেন এখন শুধুই দেওয়াল আর ছাদ।

হিংসোটে হয়ে গেছে সবাই। আগে এমন ছিল না। সবকিছুর শুরু দাদার সেই শেষ সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির পর থেকেই।

দাদার জীবদ্দশায়, আমার ছোট চাচা তালেব চুপিসারে দশ শতাংশ জমি নিজের নামে লিখে নিয়েছিল। আমাদের পরিবার বড়—ছয় ভাই, এক বোন। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে তালেব চাচার সেই কাজ যেন বিষ ঢেলে দেয় দাদার মনের কোণায়। ছোট ভাই বলে দাদা তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সেই ব্যথা সহ্য করতে পারেননি।

তারপর শুরু হলো পরিবারভিত্তিক কলহ। জমির ভাগাভাগি নিয়ে দুই ফুফুর মধ্যেও শুরু হয়েছিল বিরোধ। এক ফুফুর ছেলে রাগের মাথায় অন্যজনের মোটর ভেঙে দেয়। সেই ঘটনার পর দরবার বসে, কিন্তু শান্তি আর ফিরে আসেনি। এরপরই হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন দাদা। শরীর ভেঙে পড়ে একেবারে।

দুই ফুফু ছুটে আসে তাকে দেখতে। কিন্তু বিকেলে আবার সেই পুরনো ক্ষত উসকে ওঠে, শুরু হয় ঝগড়া। আর সেদিন রাত ১১টা... দাদা যেন সেই কলহের ভেতরেই নিঃশব্দে বিদায় নেন।

অনেকে বলে, মৃত্যু আসে যখন প্রয়োজন ফুরায়। দাদারও বুঝি তাই হয়েছিল।

সেই রাতের কান্না আজও কানে বাজে। কেউ ঘুমায়নি সেদিন। শুক্রবার দুপুরে দাদাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে ফিরে আসার পর থেকেই বাড়িটার আলো নিভে গেছে–মনের আলো। এখন কেউ আর কারো ঘরে যায় না। এই নিঃসঙ্গতা যেন নিয়ম হয়ে গেছে।

বিদ্যুৎ অফিসে ফোন দেওয়া হয়েছে, কেউ ধরেনি। এদের ফোন ধরার ইচ্ছেটাও যেন সময়ে-অসময়ে।

পড়া-লেখা শেষ, কিছুই করার নেই। ভাবলাম, একটু হেঁটে আসি।

ঘর থেকে বের হলাম টর্চ নিয়ে। এই বাড়িতে কিছু স্থান আছে যেখানে গেলে গা ছমছম করে–দুই তালার সিঁড়ি, দাদার ঘরের সামনে বসার জায়গাটা, আর বাড়ির পেছনের ঝাড়। দাদা বসতেন সেই ঘরের সামনের চৌকিটায়–চুপচাপ।

হাঁটতে বেরোতেই বাবা বললেন, “কোথায় যাচ্ছিস?”

বাবা সাধারণত ‘তুমি’ ডাকেন না। আজকে ডাকে যেন একটা অদ্ভুত স্নেহ ছিল।

আমি বললাম, “একটু হাঁটতে যাচ্ছি, বিদ্যুৎ নেই, পড়াও শেষ।"

বাবা বললেন, “তবে যা, ভালো লাগবে।"

বাবা–আবু সিরাজ, একজন সরকারি কর্মকর্তা। দাদার শেষ সম্পত্তি পাননি, তবু মুখে কিছু বলেননি। কিন্তু চোখের ভেতর যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। তালেব চাচার প্রতি ভালোবাসা ছিল তার, তাই বিশ্বাসভঙ্গটা খুব পুড়িয়েছিল তাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেলাম। টর্চ বের করতে গিয়ে দেখি–পকেট ফাঁকা! টর্চটা নেই! মাথা ঝিমঝিম করছে। কারণ টর্চটা শুধু একটা আলো ছিল না, ছিল দাদার শেষ স্মৃতি।

দৌড়ে ঘরে ফিরে এলাম।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, “কই যাচ্ছিস, মাত্রই না বের হলি?”

বললাম, “দাদার টর্চটা হারিয়ে ফেলেছি।”

বাবা বললেন, “একটা পুরনো টর্চ হারিয়েছে, ভালো হয়েছে!”

মা বললেন, “চিন্তা করিস না, তোকে আরেকটা কিনে দেব।”

বোনের টর্চ নিয়ে আবার বের হলাম। যত খুঁজলাম, টর্চটা আর খুঁজে পেলাম না। মনটা ভার হয়ে গেল।

চুপচাপ ছাদে চলে গেলাম। সেখানে একটি পুরোনো আরাম চেয়ার আছে, দাদার পছন্দের। বসে আকাশের দিকে তাকালাম। লক্ষ লক্ষ তারার ভিড়ে এক ফালি হলুদ চাঁদ। পূর্ণিমা আজ।

জোছনার আলো ছাদটাকে যেন অন্য এক জগতে নিয়ে গেছে। হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো নড়ছে, কাঠগোলাপ গাছের সৌরভে ছাদটা সুবাসিত। মন ভরে উঠল হুমায়ুন আহমেদের গান দিয়ে:

“চাঁদনী প্রসরে কে আমায় স্মরণ করে…”

চাঁদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল একদিন এক ম্যামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “ম্যাম, নাটকে দেখি সাদা চাঁদ, আপনি সাদা চাঁদ দেখেছেন কখনো?”

তিনি বলেছিলেন, “অনেক বার। তুমি দেখো না?”

“না…”

“দেখবে। প্রতিদিন ছাদে উঠে তাকিয়ে থাকো। সাদা চাঁদ একদিন ঠিকই ধরা দেবে।”

ঠিক তখনই সিঁড়ির ধাপ ধপধপ করে কাঁপিয়ে ছাদে এল চাঁদনি–আমার মামাতো বোন। সাত বছর ধরে আমাদের বাড়িতে থাকে। গ্রামে ভালো পড়াশোনা হয় না, তাই আম্মা তাকে নিয়ে এসেছিলেন ফাইভে থাকতে।

ভালো ফল করেছে–৪.৬১। আমার সামনে চেয়ারে এসে বসল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

“পড়াশোনার কী খবর?”

সে হেসে বলল,

“মোটামুটি।”

আমি বললাম,

“কেমন মোটামুটি?”

সে এবার হাসিমুখে বলল,

“খুব ভালো।”

তারপর চুপ করে বসে থাকলাম দুজন। চারপাশে নীরবতা, মাথার ওপর হলুদ চাঁদ, আর আমাদের মাঝে নানান স্মৃতি।

চাঁদনি চুপ করে বসে আছে। পূর্ণিমার আলোয় তার মুখটা যেন কেমন স্বচ্ছ লাগছে–একটুকরো সাদাকালো ছবি যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল,

"তুই কি দাদাকে বেশি ভালোবাসতিস?"

আমি উত্তর দিলাম না। শুধু মাথা নেড়ে জানালাম–ভালোবাসতাম।

সে আবার বলল,

"আমার দাদু মারা গেলে আমি একবারও কাঁদতে পারিনি। অথচ তোর দাদুর জন্য কতবার কেঁদেছি আমি, জানিস?"

আমি চমকে উঠলাম।

"তুই... কাঁদিস দাদুর জন্য?"

সে হেসে বলল,

"তুই জানিস না, দাদু আমাকে কখনোই 'মামাতো' বলে মনে করত না। ওর ঘরে আমি ছিলাম 'নাতনি'।"

এক মুহূর্তের জন্য বাতাস থমকে গেল যেন। হঠাৎ করেই চারপাশটা ভারি লাগতে শুরু করল। মনটা কেমন যেন ব্যথা করতে লাগল।

চাঁদনি বলল,

"দাদুর ঘরটার সামনে এখনও যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সাহস পাই না।"

আমি বললাম,

"চল, যাই।"

সে অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

"এখন?"

"হ্যাঁ। এখন। বিদ্যুৎ নেই, আলো নেই। আজ যদি না যাই, আর কখন?"

আমরা দুজন নেমে এলাম ছাদ থেকে। ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে চললাম সেই ঘরের দিকে–যেখানে দাদা একদিন বই পড়তেন, চা খেতেন, হেসে হেসে গল্প করতেন।

ঘরের সামনে পৌঁছতেই হঠাৎ হাওয়ার একটা ঝাপটা দরজাটাকে অদ্‌ভুতভাবে খচখচ করে তুলল। চাঁদনি আমার হাতটা চেপে ধরল।

আমি বললাম,

"ভয় পাস না।"

ঘরের দরজাটা খোলা। ভিতরটা অন্ধকার। দেয়ালের কোণায় এখনও দাদার পুরোনো আলমারিটা দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলের ওপর একটা কলম আর পুরোনো চশমা–যেন কেউ আজও ব্যবহার করে।

চাঁদনি মৃদু কাঁপতে কাঁপতে বলল,

"তোর মনে হয় না, দাদুর কিছু জিনিস এখনও বেঁচে আছে?"

আমি বললাম,

"তোর মনে হয় দাদু মরে গেছে?"

চাঁদনি চুপ করে গেল।

আমরা দুজন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম দরজার কাছে। তারপর সে হঠাৎ বলল,

"তোর ছোট চাচা তালেব চাচার ঘরে একদিন গিয়ে দেখেছিলাম... দাদুর একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি ওখানে ঝুলে আছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়, চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।"

আমার শরীর শিউরে উঠল। এতদিন ধরে এই বাড়ির প্রতিটি দেয়াল, জানালা, বাতাস–সব জানে কতটা কষ্ট পুষে রাখা আছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু কেউ বলে না, কেউ বোঝে না।

সেই রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। চাঁদনি-ও না।

আমার মনে হচ্ছিল–এই অন্ধকার বাড়িতে, এই পরিবারের নিঃশব্দ সম্পর্কগুলো যেন ধীরে ধীরে ভাঙছে··· বা, নতুন করে জোড়া লাগতে চাইছে।

আর তখনই একটা নতুন প্রশ্ন মাথায় এলো–

"দাদার মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় তালেব চাচা কোথায় ছিলেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না।

কিন্তু জানতে হবে। কারণ হয়তো এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে দাদার হঠাৎ করে চলে যাওয়ার আসল কারণ।

পরের দিন সকালের আলো একটু মিষ্টি। বিদ্যুৎ এসেছে রাত তিনটায়, কিন্তু ঘরের ভেতরের সেই শূন্যতা–তাতে আলো নেই, বিদ্যুৎ নেই। আমি জানালার পাশ থেকে বাইরে তাকালাম, উঠোনে তালেব চাচা হেঁটে যাচ্ছেন। সাদা পাঞ্জাবি পরে, হাতে কিছু কাগজ। চাচার মুখে আজ এক ধরনের গম্ভীরতা।

চাঁদনি এসে বলল,

"তুই শুনেছিস, কাল রাতে চাচা নাকি দাদার আলমারির কিছু জিনিস সরিয়েছেন?"

"কে বলল তোকে?" আমি চমকে উঠলাম।

"বুয়া বলল। ভোরে সে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে তালেব চাচা দাদার ঘরে ঢুকেছেন। একটা পুরনো কাপড়ের ব্যাগে কিছু ভরে নিয়ে গেছেন।"

আমার বুকের ভেতরটা ধপধপ করতে লাগল।

"চল, চাচার ঘরে যাওয়া যাক।"

চাঁদনি একটু পিছিয়ে পড়ল,

"এটা ঠিক হবে?"

"ঠিক বা বেঠিক না, দরকারি।"

আমরা তালেব চাচার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভিতরে কেউ নেই। দরজা খোলা। চাচার বইয়ের র্যাকের পেছনের দিকেই ঝুলছে সেই ছেঁড়া সাদা পাঞ্জাবি। এক কোণায় দাগ, আরেক কোণায় দারুণ গন্ধ–দাদার শরীরের গন্ধ।

চাঁদনি মৃদু গলায় বলল,

"এটাই তো বলেছিলাম! দাদার পাঞ্জাবি এটা!"

আমি কাছে গিয়ে দেখলাম পাঞ্জাবির পকেটে কিছু একটা অল্প দেখা যাচ্ছে। কাগজের মতো। খুব সাবধানে তা বের করলাম।

পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া একটা কাগজের টুকরো। লেখাগুলো কিছুটা অস্পষ্ট। কিন্তু কিছু শব্দ পড়া যাচ্ছে–

"...যদি আমি মারা যাই, তাহলে এই সম্পত্তির হিসেব যেন সবাই জানে। তালেব যে কাজটি করেছে, তা আমি…"

হঠাৎ পেছন থেকে দরজার কাঠে একটা শব্দ হলো–ঠক্।

আমরা দুইজনেই চমকে পিছনে তাকালাম।

তালেব চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা থমথমে। চোখ দুটো এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন শত শত প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছেই চান।

"এত সকালে আমার ঘরে কী করছ তোমরা?" চাচার গলা একটুখানি কাঁপছে।

আমি হাতের কাগজটা পিছনে লুকিয়ে বললাম,

"আপনার ঘরে একটা পরিচিত জিনিস খুঁজতে এসেছিলাম।"

চাচা বললেন,

"তোমাদের দাদার অনেক কিছুই এখানে আছে। কিন্তু কিছু জিনিস আমি নিজের জন্য রেখেছি। সেটা তোমাদের অনুমতি লাগবে না।"

চাঁদনি বলল,

"কিন্তু আপনি তো কাউকে কিছু জানাননি!"

চাচা আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখটা মুহূর্তে কেমন যেন শক্ত হয়ে গেল।

"তোমরা কি সন্দেহ করো আমি কিছু করেছি?"

আমি কিছু বললাম না। কিন্তু কাগজটা পকেটে ভরে ফেললাম চুপচাপ। জানি, এই কাগজের ভেতর লুকানো আছে অনেক উত্তর, যা এখনই খোলার সময় হয়নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। চাঁদনি ধীরে ধীরে বলল,

"আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চাচার চোখে আজ যা দেখলাম, আগে কোনোদিন দেখিনি।"

আমি বললাম,

"আমারও না। মনে হচ্ছে, কিছু একটা সত্যি গোপন আছে। আর সেটা খুঁজে বের করাই এখন আমাদের কাজ।"

সেই রাতেই আমি কাগজটার নিচে লেখা কয়েকটি লাইন পরিষ্কার দেখতে পেলাম–

"...আবু সিরাজ যদি এই চিঠিটা পায়, তাহলে সে জানবে আমি সব জানতাম। কিন্তু পরিবার যেন না ভাঙে–এই আমার শেষ চাওয়া…"

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে হিম বয়ে গেল।

দাদা সব জানতেন। সবকিছু।

তবু চুপ ছিলেন, শান্ত ছিলেন। কেন?

সন্ধ্যা নেমেছে। বাড়িটার চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে কোথাও কুকুরের ডেকে ওঠা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

চাঁদনি বলল,

"তুই কি জানিস, এই বাড়ির পেছনের ঝাড়টার নাম সবাই ‘দোযখের ঝাড়’ বলে?"

আমি হেসে ফেললাম,

"কারা বলে?"

"বুয়ারা। ছোটবেলায় বলত, কেউ নাকি ওই ঝাড়ের পেছনে গেলে কিছুক্ষণ 'হারিয়ে' যায়। সময়ের হিসেব থাকে না। আর যেটা ভয়ঙ্কর, ফিরে এসে তারা আগের মতো থাকে না।"

আমি বললাম,

"তুই তো আজকাল বেশ গল্প লেখার মতো কথা বলিস।"

চাঁদনি কাঁধ উঁচু করে বলল,

"তবু তুই যাবি তো?"

আমি একটু চুপ করে থাকলাম।

তারপর বললাম,

"আজ সন্ধ্যায় যাওয়া যাক। দাদার কথা যত ভাবছি, মনে হচ্ছে কিছু একটা ওখানে আছে–দেখা দরকার।"

আমরা দু' জন, দুটো টর্চ হাতে নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পাতা মচমচ করে উঠছে। বাতাস থমথমে। ঝাড়টা বাড়ির সবচেয়ে পুরনো অংশের পাশে–দাদার পৈত্রিক আমলের আম গাছ, কড়ই গাছ, আর ঝোপঝাড় মিলিয়ে এক রহস্যময় বনানির মতো।

ঝোপের কাছে গিয়ে চাঁদনি বলল,

"দ্যাখ, ওখানে কী যেন একটা কাপড় ঝুলছে না?"

আমি টর্চের আলো ফেলে দেখলাম–একটা পুরনো ফতুয়া, হয়তো কারো ফেলে যাওয়া। কিন্তু সেটা কেমন অদ্ভুতভাবে কাঁটাঝোপে জড়িয়ে আছে। যেন কেউ ইচ্ছা করেই রেখেছে।

চাঁদনি ফিসফিস করে বলল,

"এই তো সেই জায়গা–এই ঝাড়ের নিচেই দাদাকে শেষবার বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল, মৃত্যুর দুইদিন আগে।"

আমার মনে পড়ল, সেই দিন বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল। দাদা ভেজা পাঞ্জাবি পরে উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর হঠাৎ নিখোঁজ–সবাই খুঁজে পাচ্ছিল না। পরে এই ঝাড়ের নিচে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। সেদিন থেকেই শুরু দাদার জ্বর। তারপর… মৃত্যু।

আমি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে পায়ের নিচে টের পেলাম–মাটি কিছুটা খুঁচানো। একটা জায়গা অদ্ভুতভাবে নরম।

"চাঁদনি, টর্চটা একটু ধর।"

আমি হাত দিয়ে মাটি সরাতে শুরু করলাম। অল্প কিছু খোঁড়ার পর হাত পড়ল শক্ত কিছুর ওপর–একটা কাঠের বাক্স।

চাঁদনি কেঁপে উঠল,

"ওরে বাবা… এটা কি দাদার কিছু?"

আমি বাক্সটা বের করে ধুলো ঝেড়ে তুলে নিলাম। পুরনো, জংধরা তালা। কিন্তু তালা ছিল খোলা।

বাক্সটা খুলতেই চোখ আটকে গেল ভেতরের জিনিসগুলোতে–

- একটি পুরনো ছবি: দাদা, তালেব চাচা, আরও একজন অচেনা লোক।
- একটি রক্তচিহ্নমাখা রুমাল।
- একটি দলিল–হাতের লেখা প্রায় মুছে গেছে।
- এবং একটি খাম–যার গায়ে লেখা:

"আবু সিরাজ বা তার সন্তান যদি পায়, তাহলে পড়বে। নয়তো পোড়াবে।"

আমার বুক ধুকধুক করতে লাগল। চাঁদনি বলল,

"দাদার এই গোপন বাক্স?... তালেব চাচা তো কিছু বলেননি!"

আমি ফিসফিস করে বললাম,

"তাই তো সমস্যা। তিনি বললে হয়তো আমরা আজ এখানে থাকতাম না।"

ঠিক তখনই ঝাড়ের পেছন থেকে একটা চাপা শব্দ এল—

ফুস্ ফুস্... কচ কচ্…

চাঁদনি আমার হাত চেপে ধরল।

"তুই… তুই শুনছিস?"

আমি বললাম,

"চুপ থাক। আলো নিভা… কেউ হয়তো দেখছে আমাদের।"

আমরা আলোর রশ্মি নিভিয়ে, বাক্সটা হাতে চুপচাপ পেছনে হাঁটতে থাকলাম। বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, আমাদের পেছনে কেউ যেন ধীরে ধীরে হাঁটছে।

ঘরে ফিরে তালা দিলাম। চাঁদনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,

"তুই কি ভাবিস… দাদার মৃত্যুটা… দুর্ঘটনা ছিল না?"

আমি উত্তর দিলাম না। শুধু জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম।

ঝাড়টার দিকে, সেই গাঢ় অন্ধকারে, এক জোড়া চোখ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের বাতি জ্বলছে। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক আর বাড়ির নিঃস্তব্ধতা মিলিয়ে একটা গা ছমছমে পরিবেশ।

চাঁদনি চুপ করে বসে আছে খাটের কোণায়। আমার হাতের মধ্যে সেই খাম, যার গায়ে স্পষ্ট করে দাদার হাতের লেখা:

"আবু সিরাজ বা তার সন্তান যদি পায়, তাহলে পড়বে। নয়তো পোড়াবে।"

আমি ধীরে ধীরে খামটা খুললাম। ভেতরে তিন পৃষ্ঠার হাতের লেখা চিঠি। কাগজগুলো পুরনো, কিনারা খানিকটা ছেঁড়া। লেখা পড়া যায়, কিন্তু অক্ষরে কাঁপুনি স্পষ্ট।

চিঠি শুরু হয় এভাবে–

"সিরাজ,

তুমি যদি এই চিঠি পাও, বুঝে নিও, আমি আর নেই। আমি যেটুকু রেখে গেলাম, তার অনেকটাই বোঝা। ক্ষমা করে দিও। আমার মৃত্যুর আগে তোমাকে এই কথাগুলো জানানো উচিত ছিল, পারিনি। সাহস হয়নি।"

আমার চোখ আটকে গেল পরের প্যারায়–

"তালেবের হাতে আমি দশ শতাংশ জমি লিখে দিয়েছিলাম স্বেচ্ছায় নয়, চাপের মুখে।

সে সময় তোমার এক ভাইয়ের ব্যবসায় বড় ক্ষতি হয়েছিল। তালেব বলেছিল, জমির দলিল না দিলে সে বাড়ি বিক্রি করে দেবে–আমার অজান্তেই অনেক কিছু করেছিল সে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম… পরিবার ভেঙে যাবে।

তোমরা সবাই জানলে হয়তো ওকে ক্ষমা করতে না, তাই চুপ থেকেছিলাম।"

চাঁদনি ফিসফিস করে বলল,

“তাহলে সত্যি, দাদা জানতেন। চুপ করে ছিলেন পরিবার বাঁচানোর জন্য।”

আমি পড়তে লাগলাম শেষ অংশ–

“সিরাজ, তুই সৎ। তোর মধ্যে কোনো লোভ নেই। আমি জানি তুই কখনো সম্পত্তির জন্য বাড়াবাড়ি করবি না। কিন্তু যদি কখনো এমন সময় আসে, যখন সবাই একে অপরকে ভুল বোঝে, তখন এই চিঠিটা খুলবি।

এটা কোনো সম্পত্তির দলিল নয়,

এটা আমার শান্তির জন্য লেখা।

আমি চাইনি, আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলেমেয়েরা মুখ ফিরিয়ে থাকুক একে অন্যের দিকে।

জমি নেই তো কি হয়েছে? বাড়ি আছে। স্মৃতি আছে। সম্পর্কগুলো ঠিক থাকুক।

চিঠিটা পড়ে পুড়িয়ে ফেলবি।

আর যদি না পারিস, তবে চাঁদে তাকাবি–সেখানে আমার চেহারা পাবি। মনে পড়বে আমি কেমন ছিলাম।”

চিঠির নিচে সই–মুহম্মদ আব্দুল গফফার।

আমার দাদার স্বাক্ষর। ছোট করে এক কোণে লেখা:

"স্মৃতি আর মানুষ–এই দুই-ই শেষ পর্যন্ত আমাদের ধরে রাখে।"

চুপচাপ হয়ে গেলাম। চাঁদনির চোখে পানি টলটল করছে।

আমি ধীরে বললাম,

“তুই জানিস, দাদাকে নিয়ে আমাদের যত অভিমান, এই চিঠি সেগুলোকে ছোট করে দিল। যেন সবকিছুর পেছনে ছিল শুধু একটা ব্যথা, একটা নিরব চেষ্টা–সবাইকে একসাথে রাখার।”

চাঁদনি বলল,

“কিন্তু এই চিঠি তো কাউকে দেখানো যাবে না, তাই তো?”

আমি মাথা নাড়লাম।

“না। এটা আমার দায়িত্ব এখন। কিন্তু তালেব চাচাকে সত্যিটা জানাতে হবে–ভদ্রভাবে, ধীরে, যেন সম্পর্কটা না ভাঙে।”

চাঁদনি বলল,

“তুই জানিস, দাদার চিঠির একেকটা শব্দ যেন তার চেহারা চোখে এনে দিল। আমি আবার দেখতে পেলাম তাকে, উঠানে বসে কাঠের চেয়ারটায়, পাঞ্জাবির পকেটে সেই টর্চটা…”

আমরা দুইজন চুপচাপ হয়ে গেলাম। বাতি নিভিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে চাঁদের দিকে তাকালাম।

চাঁদটা আজও সেই হলুদ, দাদার মুখের মতো মায়াভরা।

বিকাল ৫টা।

বাড়ির উঠানে প্রথমবারের মতো একটা গোল চেয়ারের সারি। মাঝখানে কাঠের পুরোনো একটা টেবিল। তাতে রাখা এক মগ চা, কিছু বিস্কুট, আর একটা ছোট মাটির প্রদীপ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমি। পাশে চাঁদনি।

আমার বাবাকে–আবু সিরাজকে–অনুরোধ করে সবাইকে একত্র করেছিলাম। কারও মুখে আগ্রহ নেই, কারও চোখে অবিশ্বাস, কারও মনে রাগ।

তালেব চাচা এলেন একটু পরে। চোখে ঠান্ডা হাসি, মুখে অনুচ্চার ভরসা।

চুপচাপ সবাই বসল।

আমি বললাম,

"আজ কিছু বলার আছে। না চিৎকার করব, না বিচার করব। শুধু একটা লেখা পড়ব। তারপর যে যার মতো সিদ্ধান্ত নেবে।"

আমি পকেট থেকে সেই চিঠিটি বের করলাম। দাদার হাতে লেখা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম পুরোটা।

সবার মুখ স্তব্ধ। তালেব চাচার কপাল ঘামছে। বড় ফুফু চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে, আর আমার মা চোখ মুছছেন।

বাবা মুখ নিচু করে বললেন,

"দাদা এমন কিছু লুকিয়ে রেখেছিলেন… আমি ভাবতেও পারি না…"

চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর তালেব চাচা ধীরে বললেন,

"আমি লোভ করেছিলাম। ভেবেছিলাম দাদা কিছুই বলবেন না। কিন্তু উনি তো মাফ করে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। আমি… আমি ওনার মতো হতে পারিনি।"

এক ফুফু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,

"দাদা অনেক কিছু সহ্য করতেন, কিন্তু পরিবারের কেউ জানত না উনি কতটা একা হয়ে পড়েছিলেন।"

চাঁদনি হঠাৎ বলে উঠল,

"তাহলে এখন আমরা কী করব? আবার আগের মতো হব?"

আমার ঠোঁটে একটা হাসি এলো।

আমি বললাম,

“আগের মতো নয়। বরং, নতুন করে।

প্রতিটা সম্পর্ককে একবার করে ঝাঁকুনি দিয়ে, ধুলো ঝেড়ে, আবার শুরু করব।

এই বাড়িটা এখনও বেঁচে আছে। আমাদের হাতেই এর জীবন।”

তালেব চাচা উঠে এসে বাবার কাঁধে হাত রাখলেন।

“সিরাজ, তুই আমার ছোটো ভাই হয়েও বড় ছিলি সবসময়।

ভুল করেছি, তবু চাই ক্ষমা।”

বাবা কিছু বললেন না। কিন্তু মাথা হেলালেন–সেই সম্মতির ভাষায় যা কথা ছাড়াই অনেক কিছু বলে দেয়।

এক সময় সবাই বসে পড়ল গল্প করতে–পুরোনো দিনের কথা, দাদার কথা, উঠানের আমগাছের কথা, কাঠগোলাপের সুবাস, আর সেই আলো-অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে যাওয়া টর্চের কথা…

আজ বহু বছর পর উঠানে চায়ের কাপ কম পড়ছে।

রাত ১০টা।

বাড়ির আলো এখন জ্বলছে। বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে।

চায়ের কাপগুলো ধুয়ে রাখা হয়েছে, উঠানের চেয়ারগুলো আবার খালি।

কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এখন একটাই কথা ঘুরছে–

দাদার টর্চটা গেল কোথায়?

চাঁদনি পাশে এসে দাঁড়াল।

“টর্চটা যদি দাদা নিজেই কোথাও রেখে গিয়ে থাকেন?”

আমি চমকে তাকালাম।

“কী বলছিস?”

চাঁদনি বলল,

“দাদা তো জানতেন, কোনো না কোনো সময় একটা কিছু হবে। তিনি কি তবে আগে থেকেই কিছু ইশারা রেখে গেছেন?”

আমি গা শিউরে উঠতে লাগল।

দাদার ঘরটা এখন তালা দেওয়া, ওটাই সবচেয়ে অন্ধকার জায়গা বাড়ির।

চুপচাপ গিয়ে চাবি বের করলাম আলমারি থেকে।

চাঁদনি সাথে রইল।

ঘরের দরজা খুলতেই একটা গন্ধ এল—পুরোনো কাগজের, ধুলোর, আর একটা অজানা বিষণ্নতার।

বইয়ের তাকগুলো যেমন ছিল, তেমনই আছে। টেবিলের ওপরের কাপড়টা একটু পচে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে তাকের নিচে মাথা ঢুকিয়ে টর্চের আলো ফেললাম (চাঁদনির টর্চ)।

একটা ছোটো কাঠের বাক্স! আগে কখনও দেখিনি।

তুলি।

বাক্সটা বেশ ভারি। খুলতেই দেখি—ভেতরে একটা চিঠি, একটা পুরোনো রুমাল,

আর সেই দাদার টর্চ।

চাঁদনি বলল,

“এই টর্চটা এখানে কীভাবে এল?”

আমি বললাম,

“দেখে মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছে করে রেখেছে–আমার জন্য।”

চিঠিটা খুললাম।

আরও একবার দাদার লেখা।

এবার একটু সংক্ষিপ্ত।

“টর্চটা আমার নয়, তোমার।

যেদিন তুমি সত্যিকারের অন্ধকার বুঝবে,

সেদিন এই আলোটা তোমার সবচেয়ে প্রয়োজন হবে।

তুমি যখন এই বাক্সটা খুঁজে পাবে, তখন বুঝে নিও–তোমার পথ শুরু হয়েছে।”

আমি স্তব্ধ।

চাঁদনি ফিসফিস করে বলল,

“তাহলে দাদা চাইতেন, তুই কিছু খুঁজে বের করিস। শুধু পরিবারকে নয়–পুরো অতীতকে।”

আমি বললাম,

“এই টর্চটা শুধু আলো নয়। এটা চাবি।

এই বাড়ির ভেতর এমন কিছু আছে, যা এখনও কেউ জানে না।”

চাঁদনি বলল,

“তাহলে চল শুরু করি খোঁজ।”

আমি সেই টর্চটা হাতে নিলাম। বোতাম চেপে দিলাম।

টিক...

আলো জ্বলে উঠল।

সেই আলোয় ধরা পড়ল এক পুরোনো বইয়ের পিছনের পাতায় একটা খোদাই লেখা–

"উঠানের নিচে, পশ্চিম কোণায়, যেখানে কাঠগোলাপ ঝরে পড়ে…"

আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল।

রাত ১১টা।

চাঁদনি আর আমি একসাথে দাঁড়িয়ে কাঠগোলাপ গাছটার পাশে।

জোছনার আলোয় ঝরে-পড়া পাপড়িগুলো যেন মাটির উপর একটা নিঃশব্দ ছায়া হয়ে বসে আছে।

টর্চটা হাতে নিয়ে জায়গাটা ঠিক করলাম–উঠানের পশ্চিম কোণ, গাছের ডানদিকটা।

চাঁদনি বলল,

"তুই নিশ্চিত?"

আমি মাথা নাড়লাম,

"না। কিন্তু টর্চটা ঠিক এখানেই ইশারা করেছে।"

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাতাস থেমে গেছে। হঠাৎ করে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

কুড়াল আনলাম।

ধীরে ধীরে মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম।

মাটি ছিল কিছুটা আলগা। যেন কেউ আগে থেকেই একটু নাড়া দিয়েছিল।

হঠাৎ টুং···

কিছুর সাথে কুড়াল লেগে গেল।

আমার হাত কেঁপে উঠল।

চাঁদনি ফিসফিস করল,

“কী হল?”

আমি ধুলো সরিয়ে দেখি–একটা লোহার সিন্দুক। খুবই পুরোনো, কিন্তু তালা নেই।

ধীরে ধীরে ঢাকনা তুললাম।

ভেতরে–

১. একটা পুরোনো ডায়েরি

২. একটা ছবির ফ্রেম

৩. আর একটা ছোটো, হলুদ খাম।

আমি প্রথমে ডায়েরিটা তুললাম।

মাথার ভেতর কেমন ঘূর্ণি উঠছে–দাদার লেখা। কিন্তু এই ডায়েরি আমাদের কাউকে কেউ কখনো দেখায়নি।

চাঁদনি বলল,

“এটা কীসের ডায়েরি?”

আমি প্রথম পাতাটা খুললাম।

“২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

আজ আমি লতিফাকে শেষবার দেখলাম।

ও বলল, আমি যেন আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি।

আমরা একসাথে পারব না, কারণ আমার পরিবার ওকে মেনে নেবে না।

কিন্তু আমি ওর জন্য কিছু রেখে যেতে চাই।”

আমি থেমে গেলাম।

চাঁদনি কাঁপা গলায় বলল,

“লতিফা কে?”

আমি কিছু বলিনি। ডায়েরির পাতা উল্টাতে থাকলাম।

সব পৃষ্ঠায় লতিফা নাম–ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি, ত্যাগ, আর অব্যক্ত অভিমান।

ছবিটার দিকে তাকালাম।

একটি নারী–বিকেলবেলা কাঠগোলাপের নিচে দাঁড়িয়ে হাসছে।

ছবির পেছনে লেখা–"তোমার কাঠগোলাপ, আমার অপেক্ষা।"

আর সেই হলুদ খামের ভেতর ছিল একটা চিঠি… আমার মায়ের নামে।

আমি চিঠিটা খুললাম।

**“আসমা,

তুই যখন এই চিঠিটা পাবি, তখন বুঝবি আমি তোকে কিছু লুকিয়ে রেখেছিলাম।

না পাপের মতো না, বরং এক সময়ের অসমাপ্ত ভালোবাসা।

আমি লতিফাকে বিয়ে করিনি, কিন্তু তার একটা ছেলেমেয়ে ছিল আমার।

আমি জীবনে একটা ভুল করেছিলাম–ওদের দূরে রেখে দিয়েছিলাম।

কিন্তু চাই না, এই ভুল ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পৌঁছাক।

তুই শক্তিসম্পন্ন, তুই সবার চেয়ে বেশি বুঝিস।

তুই পারবি আমাদের সবার জন্য এক নতুন সম্পর্কের জায়গা গড়তে।

– তোর ভাই,

আব্দুর রশিদ (তোর দাদা)”**

আমি ঘামছিলাম।

চাঁদনি আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

“তুই বুঝছিস, এটার মানে কী?”

আমি মাথা নিচু করে বললাম,

“দাদার একটা গোপন পরিবার ছিল।

আর আমরা… কেউ জানতাম না।

এটাই সেই রহস্য… যা উনি বলে যেতে পারেননি।”

চাঁদনি বলল,

“তাহলে এখন কী করবি?”

আমি বললাম,

“খুঁজে বের করব লতিফার সন্তানদের।

তারা যদি এখনও বেঁচে থাকে, তাহলে এই বাড়ি কেবল ইতিহাস নয়–চূড়ান্ত সত্য হয়ে উঠবে।”

রাত প্রায় শেষ।

ঘড়ির কাঁটা ৩টার ঘরে পৌঁছেছে।

তবু আমার ঘুম নেই।

ডায়েরি, ছবি, চিঠিগুলো ছড়িয়ে আছে বিছানায়।

চাঁদনি পাশের চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার চোখ কিন্তু স্থির–দাদার লেখার শেষ লাইনটায়।

"তুই পারবি আমাদের সবার জন্য এক নতুন সম্পর্কের জায়গা গড়তে।"

আমি পারব?

আমি তো দাদার মতো না।

আমি এখনো অন্ধকারে টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছি–পথ খুঁজছি।

সকাল হল।

চাঁদনি উঠে বলল,

“তোর এখন কী প্ল্যান?”

আমি বললাম,

“খোঁজ শুরু করতে হবে। ডায়েরিতে কিছু জায়গার নাম আছে–'তালতলা হাট', 'রহিম গলি', 'বটতলা ক্লিনিক'... এইসব জায়গা ধরেই খুঁজতে হবে।”

চাঁদনি বলল,

“তাহলে গ্রামেই যেতে হবে প্রথমে?”

আমি মাথা নাড়লাম,

“হ্যাঁ। দাদার শিকড়ের দিকে ফিরে যেতে হবে। ওখানেই হয়তো লতিফার শেষ চিহ্ন রয়ে গেছে।”

আমার মা–আসমা বেগম–চুপ করে আমাদের কথাগুলো শুনছিলেন।

তিনি ধীরে কাছে এসে চুপচাপ ছবিটা হাতে নিলেন।

দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

“এখন বুঝি কেনো বাবা একা থাকতে চাইত, কেনো মাঝেমাঝে হঠাৎ কান্না করত।

আমি জানতাম কিছু একটা ছিল… কিন্তু এতটা গভীর, ভাবিনি কখনও।”

আমি বললাম,

“মা, আপনি কিছু জানেন? 'তালতলা' বা ‘রহিম গলি’ নামটা?”

তিনি বললেন,

“তালতলা হাট তো আমাদের গ্রামের পাশেই… আর 'রহিম গলি' ছিল পুরোনো বাজারের পেছনে, খুব সুনশান একটা জায়গা।

একজন নার্স থাকত ওখানে, নাম মনে নেই, তবে রুমাল বিক্রি করত…

বাড়ি ছিল লতিফা নামের একটা মেয়ের।”

আমি আর চাঁদনি একে অপরের দিকে তাকালাম।

দিন দুয়েক পর

আমরা বের হলাম সেই গ্রামপথে–

দাদার শৈশবের গ্রাম, ধুলোমাখা পথ, বাঁশের বেড়া ঘেরা পুকুর, পাকা আমগাছের ছায়া।

তালতলা হাটে পৌঁছে আমরা খোঁজ করলাম।

একজন বৃদ্ধ বলল,

"লতিফা? হ্যাঁরে, নাম শুনেছি ছোটবেলায়। উনি ছিলেন খুব গুণবতী মেয়ে। এক সময় হাটের পাশে ওনার একটা দোকান ছিল–নিজের বানানো পিঠা বিক্রি করতেন।

পরে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

"কেউ জানে না উনি কোথায় গেলেন?"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে বললেন,

"শুনেছিলাম ওনার একটা ছেলে ছিল। ছোট্ট, খুব চুপচাপ।

তবে তারা চলে যায় পাশের মফস্বল শহরে– 'নন্দিপুর'।

সেখানে নাকি ছেলেটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিল।

তোর যদি খোঁজ করতে হয়, ওদিকেই যা।"

সেই রাতেই আমি ডায়েরির পেছনে দাদার শেষ একটা বাক্য খুঁজে পেলাম–

"নন্দিপুর বোর্ডিং স্কুলের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আমার ভুল।"

এইবার পথটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

নন্দিপুর শহরটা যেন ঘুমিয়ে থাকা এক পাণ্ডুলিপি–

পুরোনো দালান, কাঠের জানালা, মসৃণ পাকা রাস্তা আর মাঝেমাঝে ভেসে আসা হকারের ডাকে অতীতের ঘ্রাণ।

চাঁদনি আর আমি সকাল ১০টা নাগাদ পৌঁছালাম নন্দিপুর বোর্ডিং স্কুলে।

একতলা একটা দোতলা দালান, রঙচটা দেয়াল, ছেলেমেয়েরা ক্লাসে ঢুকছে, আর স্কুল মাঠে ফুটবল ঘুরছে।

দেখলেই বোঝা যায়–এখানে সময় থেমে থাকলেও, গল্প থেমে নেই।

আমি রিসেপশনে গিয়ে বললাম,

"একজন শিক্ষকের খোঁজ করছি–উনার নাম হয়তো 'লতিফার ছেলে' হতে পারে। আমরা জানি না নামটা ঠিক কী।"

রিসেপশনিস্ট চমকে তাকালেন,

"আপনি কি... মিঃ লতিফকে খুঁজছেন?"

আমাদের দুজনেরই গলা শুকিয়ে গেল।

আমি বললাম,

"উনার নাম লতিফ?"

তিনি বললেন,

"হ্যাঁ। মিঃ লতিফ আমাদের ইংরেজি শিক্ষক। এখানেই পড়েছেন ছোটবেলায়, তারপর এখানেই ফিরে আসেন। খুব গম্ভীর, কিন্তু শিক্ষার্থীদের খুব ভালোবাসেন। কেন খুঁজছেন ওনাকে?"

আমি বললাম,

“ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই।”

লতিফ স্যারের রুমে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো।

কাঠের দরজা ঠেলে ঢোকার আগে আমি থমকে গেলাম।

সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই মনে হচ্ছিল… আমি কোনো কবরখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি,

যেখানে মৃত ইতিহাস নিজের মতো করে বেঁচে থাকে।

দরজা খুললেন এক দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে, কাচ ফ্রেমের চশমা-পরা মানুষ।

মুখে অবিকল আমার দাদার গড়ন…

চোখের নিচে কালো ছাপ, কপালে গভীর ভাঁজ।

তিনি আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমি বললাম,

“স্যার, আপনি কি লতিফা বেগমের ছেলে?”

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

“তোমরা কারা?”

আমি দাদার ছবি, চিঠি আর ডায়েরির কপি বের করে তাঁর হাতে দিলাম।

তিনি প্রথমে চিঠিটা খুললেন।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাত কেঁপে উঠল।

চশমা খুলে চোখ মুছলেন।

চুপচাপ চেয়ারটায় বসে পড়লেন।

চাঁদনি নিচু গলায় বলল,

“স্যার, আপনি ঠিক আছেন?”

তিনি ধীরে বললেন,

“তোমরা জানো… আমার মা কখনও আমার বাবার নাম বলেননি।

তিনি শুধু বলতেন, ‘তোমার বাবা একজন ভালো মানুষ ছিল। সে তার পরিবারের কথা ভেবে তোমাকে পেছনে রেখে গেছে।’

আজ আমি প্রথমবার জানলাম সেই ভালো মানুষটা কে ছিল।”

আমরা চুপচাপ।

তিনি আবার বললেন,

“তোমরা আমার আত্মীয়? ভাইবোন?”

আমি আস্তে করে বললাম,

“দাদার পরিবারের উত্তরসূরি… মানে আপনি আমাদের চাচা।”

তিনি উঠে দাঁড়ালেন,

চোখে জল নিয়ে বললেন,

“তাহলে এতদিন আমি শুধু একজন অনাথ ছিলাম না,

আমি ছিলাম এক পরিবারের অপেক্ষার গল্প!

লতিফ স্যারের চোখে জল।

তিনি চুপ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাইরে স্কুলের ছেলেমেয়েরা খেলছে, হাসছে–তাদের মতোই কোনো একদিন হয়তো তিনিও খেলতেন…

কিন্তু আজ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এক অদ্‌ভুত বাস্তবতার সামনে–

এক অজানা ভাইয়ের সন্তান এসে তাঁকে "চাচা" বলে ডেকেছে।

তিনি বললেন,

“আমার মায়ের কথা তোমরা কিছু জানো?”

আমি বললাম,

“সরাসরি না, তবে দাদার ডায়েরিতে অনেকটা লিখা ছিল।

তিনি বলেছিলেন, ‘লতিফার কাছে আমি অপরাধী, কিন্তু তার সন্তান যেন আমার ভুলের দায় না নেয়।’ ”

স্যার ফুঁপিয়ে উঠলেন।

চাঁদনি ধীরে জিজ্ঞেস করল,

“আপনি কি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবেন? সবাই আপনাকে দেখতে চায়।”

তিনি একটু হেসে বললেন,

“তোমাদের বাড়ি?

যেখানে আমার বাবার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে?

আমি জানি না… ওরা কি মেনে নেবে আমাকে?”

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম,

“আমরা সবাই আপনার জন্য প্রস্তুত।

একটা মানুষকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু রক্তের ভাষা অস্বীকার করা যায় না।”

ফিরে আসা

তিন দিন পর আমরা সবাই ফিরলাম গ্রামে–

আমি, চাঁদনি আর লতিফ স্যার।

দুপুর বেলা যখন বাড়ির ফটকে ঢুকলাম, তখন বাড়ি অস্বাভাবিক নিঃশব্দ।

বাবা বারান্দায় বসেছিলেন–আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম,

“বাবা, উনি আপনার ভাই… দাদার আরেক সন্তান।”

বাবা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকলেন।

লতিফ স্যার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললেন,

“আমি কোনো দাবি নিয়ে আসিনি।

শুধু জানতে চেয়েছি আমার অস্তিত্বটা স্বীকার করেন কি না।”

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর ধীরে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন,

“তুই তো আমার ভাই।

কোনো দাবি-দাওয়া লাগে না।

তোর চোখেই বাবাকে দেখছি।”

পেছন থেকে মা বেরিয়ে এসে বললেন,

“তুমি আজ থেকে এই বাড়িরই একজন।

তোমার জন্য আলাদা ঘর থাকবে না–আমাদের সাথে থাকবে।”

———————————————————————

কিন্তু সবাই না...

সবাই কিন্তু মেনে নেয়নি।

আমার ছোট চাচা তালেব চুপ করে ছিলেন।

ফুফুরা কেউ কেউ সন্দেহের চোখে তাকাল।

কারণ, নতুন একজন উত্তরাধিকার মানে সম্পত্তির ভাগ আবার ভাগ হতে পারে।

চাঁদনি বলল,

“এখানে সম্পত্তির হিসাব না, ভালোবাসার জবাব চাই।

একজন মানুষ তার পরিচয় নিয়ে বেঁচেছে এত বছর। আজ তার সত্য প্রকাশ পেয়েছে–তাতে ভয় কিসের?”

লতিফ চাচা বাড়িতে এসে প্রায় এক সপ্তাহ হলো।

যতই সময় যায়, ততই বোঝা যাচ্ছে–সবাই তাঁকে সহজভাবে নিতে পারছে না।

বিশেষ করে তালেব চাচা–তিনি যেন বাড়ির মধ্যে থেকেও দূরে সরে গেছেন।

বাবা বারবার চাচার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেছেন।

তবে তার চেয়ে অদ্ভুত ছিল সেই দিনটা–

যখন বারান্দার পুরোনো একটা বাক্স খুলতে গিয়ে আমরা এক খাম পেলাম, যার গায়ে লেখা ছিল:

"তালেব, তুমি একদিন এ চিঠি পাবে।

পেলে খুলে পড়ো।

–আবু বকর (আমার দাদা)"

চিঠিটা জীর্ণ, হলুদ হয়ে গেছে।

আমি আর বাবা যখন পড়ে শোনাচ্ছিলাম, তখন সবাই ধীরে ধীরে জড়ো হলো।

তালেব চাচাও এলেন, চুপ করে।

চিঠির পাঠ

প্রিয় তালেব,

আমি জানি, তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো। আমি সব সময়ই সেটা বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু তুমি যে কাজটা করলে, দশ শতাংশ জমি নিজের নামে করে নিলে, সেটা আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছিল।

আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করতে না পারো, কিন্তু আমি সব জানতাম।

আমি কোনোদিন তোমাকে কিছু বলিনি, কারণ তুমি আমার ছোট ছেলে, আমি চাইনি তোমাকে হারাতে।

তবে তুমি যে দিন এই চিঠি পাবে, আমি হয়তো থাকব না।

আর তখন যদি আমার গোপন ছেলে লতিফ কখনও ফিরে আসে, তাহলে তাকে শুধু ভাই হিসেবে নয়–

মানুষ হিসেবে, অপরাধীর সন্তান নয় বরং বঞ্চিত এক আত্মার স্বীকৃতি দিও।

যে সম্পত্তির জন্য সবাই লড়ছে, আমি জানি সেটা একদিন ধূলায় পরিণত হবে।

কিন্তু সম্পর্কের যা ক্ষতি হবে, তা কোনোদিন পুষিয়ে উঠবে না।

তুমি ভালো থেকো।

আমি তোমায় ক্ষমা করে দিয়েছি–তুমিও নিজেকে ক্ষমা করো।

তোমার বাবা,

আবু বকর।

চিঠি পড়া শেষ হলে বারান্দার নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল–

তালেব চাচার।

চাচা উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললেন,

"আমি সব সময় ভাবতাম আমি ঠিক করেছি···

কিন্তু আজ বুঝলাম, আমি শুধু ভয় পেয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম লতিফ এলে আমার সব হারাবে, কিন্তু আসলে আমি আগেই অনেক কিছু হারিয়েছি–

বাবার বিশ্বাস, ভাইদের সম্মান, নিজের আত্মমর্যাদা।"

তিনি হেঁটে গিয়ে লতিফ চাচার সামনে দাঁড়ালেন।

"তুই যদি ক্ষমা করতে পারিস,

তাহলে আমি আবার তোর বড় ভাই হতে চাই।"

লতিফ চাচা কিছু না বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

ক্যামেরার চোখে...

চাঁদনি বলল,

"এমন একটা দিন দেখব ভাবিনি।

চিঠির শব্দগুলো এক পরিবারের ভাঙা দেয়াল আবার জোড়া দিল।"

আমি বললাম,

"চিঠি তো কেবল শব্দ নয়–

ঠিক মতো লেখা হলে, সেটা সময়কেও বদলে দিতে পারে।"

রাত তখন ২টা পেরিয়েছে।

পুরো বাড়ি নিস্তব্ধ।

হালকা বাতাসে জানালার পর্দা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। চাঁদের আলো ছাদ থেকে প্যাঁচানো সিঁড়ি ধরে নেমে এসেছে নিচে।

আমি তখনও ঘুমাইনি।

বুকের ভেতর যেন কিছু একটা কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে।

হঠাৎ কানে এল একটা শব্দ…

"টুক্… টাক্… টুক্…"

বুঝলাম নিচে কেউ হেঁটে যাচ্ছে।

চাঁদনি তখন পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

আমি ধীরে দরজা খুলে বারান্দায় এলাম।

বাড়ির ভেতরে অন্ধকার, কেবল রান্নাঘরের ছোট লাল আলো জ্বলছে।

আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালাম–

একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে... দাদার ঘরের দিকে।

আমি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম।

পায়ের শব্দ যেন বাতাসেও হারিয়ে যায়—এক নিঃশব্দ অনুপ্রবেশকারীর মতো।

তালা ভাঙা ঘর

দাদার ঘর বহু বছর ধরে বন্ধ।

তাঁর মৃত্যুর পর থেকে কেউ তেমন একটা ঢোকেনি।

মাঝে মাঝে মা ঘরটা ঝাড়ু দিতেন, কিন্তু দরজাটা সবসময় তালা দেওয়া থাকত।

আজ সেই দরজার তালা ভাঙা।

হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পেলাম—তালা ভাঙা।

আমি দরজার কাছে যেতেই ভেতর থেকে হঠাৎ এক কাঁপা কণ্ঠ ভেসে এল,

"এতদিন পর এলি, বাবু?"

আমি চমকে উঠলাম।

ভেতরে কে?

আমি ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে ঢুকলাম—

আর দেখতে পেলাম, ঘরের মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

তার আলোয় এক বৃদ্ধা বসে আছেন, চোখে ঘোমটা।

হাত কাঁপছে, শরীর কাঁপছে—কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ভয় নেই, শুধু শূন্যতা।

আমি বললাম,

"কে আপনি?"

তিনি বললেন,

“আমি এখানে ছিলাম…

বাড়ির একদম শেষ প্রান্তে, পিছনের সেই ঝাড়ের ঘরের পাশে।

তোর দাদা বলেছিল, ‘তোর মৃত্যু হবে একা, তুই যেন কাউকে আর চিনিস না।’

আমি চুপ করেছিলাম।

কিন্তু আজ মনে হলো… কারও একটা ফিরে আসা দরকার।”

আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

এই মহিলা কে?

লতিফ চাচা এলেন

আমি চুপচাপ দাদার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

চাঁদনি জেগে উঠে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা দুজন মিলে লতিফ চাচাকে ডেকে আনলাম।

চাচা এসে সেই বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে এক ধাক্কায় পিছিয়ে গেলেন।

তিনি কাঁপা গলায় বললেন,

“তুমি? মা?”

বৃদ্ধা তাকালেন তাঁর দিকে।

চোখে জল।

তিনি বললেন,

“তুই চিনলি? আমি তো তোর কণ্ঠও ভুলে গেছি…”

সত্য উন্মোচন

আমরা জানতাম দাদার এক প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু কেউ জানত না, সেই সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গিয়েছিল–

আর সেই নারীর নাম ছিল নাসরিন, লতিফ চাচার মা।

দাদা পরিবারকে না জানিয়ে তাঁকে ঘরে তুলে এনেছিলেন।

কিন্তু পরে পারিবারিক চাপ, আরেক পক্ষের ষড়যন্ত্রে দাদা তাঁকে বাড়ির এক কোণে লুকিয়ে রাখেন–

যেখানে তিনি কাটিয়ে দেন প্রায় ৩০ বছর!

কেউ জানত না।

তালেব চাচা হয়তো জানতেন কিছুটা, কিন্তু চুপ ছিলেন–সম্পত্তির ভয়ে।

বৃদ্ধার শেষ কথা

নাসরিন বললেন,

"আমার কোনো অভিযোগ নেই…

আমি শুধু চাই, এই বাড়িতে কেউ আর কাউকে ভুলে না যাক।"

তিনি মাথা নিচু করে বললেন,

"তুই আজ এলি, তোর মুখ দেখে আমার জীবন পূর্ণ হলো।"

তারপর তিনি মোমবাতির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ঘরে তখন নিস্তব্ধতা।

চাঁদের আলো ধীরে ধীরে মোমবাতির আলোকে ছুঁয়ে দিল।

দাদার ঘরে তালা ভাঙার পর থেকে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছে।

নাসরিন আপা এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেছেন, কিন্তু কষ্ট যেন থামছে না।

আমরা আলমারির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দাদা সবসময় তার পুরোনো জিনিসগুলো এখানে রাখতেন।

আলমারির এক কোণে একটা পুরোনো ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল, যার মধ্যে ছিল একটি কালো ক্যাসেট।

একটু ধুলো ঝেড়ে, ক্যাসেট প্লেয়ার চালু করলাম।

আসলে এরকম শব্দ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন সময় ঘুরে ফিরে আসছে।

রেকর্ডিংয়ের শুরু

দাদার কণ্ঠ, ভেজা, কাঁপতে কাঁপতে, বলছেন:

"আমার প্রিয়জনেরা,

এই শব্দগুলো শুনলে বুঝবে আমি আর নেই।

আমি তোমাদের অনেক কথা বলিনি, অনেক রাগ লুকিয়েছি।

শুধু এতটুকু জানাতে চাই, আমার ভুলগুলো মাফ করে দিও।

তালেব, লতিফ, সবাইকে ভালোবাসি।

আমাদের সম্পর্ক যতই জটিল হোক না কেন, আমরা একসাথে থাকব–এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।"

রেকর্ডিং শুনতে শুনতে আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো।

বাবাও স্তব্ধ হয়ে শোনেন।

দাদার শেষ কথাগুলো

দাদা আরও বললেন:

"আমি জানি, আমার মৃত্যুর পরে অনেক মনোমালিন্য হয়েছে।

শিল্পী যেমন তার শেষ রঙে ছবি আঁকে, আমি চাই আমার শেষ বার্তাও ভালোবাসায় ভরা থাকুক।

আমাদের এই সম্পত্তি, আমাদের এই ঝগড়া—সবকিছু জীবনের অস্থায়ী ছায়া মাত্র।

সবাই মিলেমিশে ভালো থেকো।

আমার আত্মা শান্তি পাবে তোমাদের ভালোবাসায়।"

রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো।

অন্তিম দৃশ্য

বাইরে নতুন দিনের সূর্য উঠে আসছে।

ঝড়ও যেন থামছে।

আলো এসে পড়ে সেই অন্ধকার ঘরের কোণে—যেখানে প্রেম, শত্রুতা, ক্ষমা ও বেদনা একসঙ্গে লুকিয়ে ছিল।

আমাদের গল্প এখানেই শেষ নয়।

কিন্তু আজকের জন্য এটা একটা নতুন সূচনা।

রাতের সেই ঘন অন্ধকার, সেই ঝড়, সেই কান্না—সবকিছু যেন ধুয়ে-মুছে দিল ভোরের আলো।

যেন বাড়িটা অনেক দিন পর একটু নিঃশ্বাস নিল।

যেন কারও গলা থেকে ভার নামলো।

চাঁদনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি চুপচাপ পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সে বলল,

“সব বদলে যাবে, তাই না?”

আমি বললাম,

“হ্যাঁ, দাদার রেকর্ডিংটা শুনে মনে হলো, আমরা খুব ছোট কিছু জিনিস নিয়ে কত বড় ভুল করে ফেলি!”

চাঁদনি বলল,

“আমি আর আগের মতো থাকতে পারব না… আমি ভেবেছি আমি গ্রামে ফিরে যাব।”

আমি চমকে তাকালাম তার দিকে।

“তুই চলে যাবি?”

সে বলল,

“এ বাড়িতে আমি অনেক কিছু পেয়েছি… কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে।”

আমি কিছু বললাম না।

কারণ জানতাম, কিছু অনুভূতি বলে বোঝানো যায় না।

বাবার একটা সিদ্ধান্ত

বাবা সেই সকালে আমাদের সবাইকে বসালেন।

ঘরে মা, আমি, চাঁদনি, তালেব চাচা, লতিফ চাচা—সবার মুখে গভীর নিরবতা।

বাবা বললেন,

“দাদার রেকর্ডিং শুনে আমি শুধু একটা জিনিস বুঝেছি—এই বাড়ির হৃদয় আমরা মেরে ফেলেছিলাম।

তাকে আবার জীবিত করতে হলে, আমাদের একসঙ্গে চলতে হবে।”

তিনি একটা প্রস্তাব দিলেন—

“দাদার শেষ সম্পত্তি আমরা সবাই মিলে মাদ্রাসা ও বৃদ্ধাশ্রম হিসেবে দান করব।

তাতে দাদার আত্মা শান্তি পাবে।”

তালেব চাচা মাথা নিচু করে বললেন,

“ভাই, আমাকে মাফ কর।

আমি তখন ছোট ছিলাম… লোভে পড়ে গিয়েছিলাম।”

বাবা উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

ঘরটা আবার আলোয় ভরে উঠল

অনেক বছর পর বাড়ির সবার মধ্যে আবার হাসির ছায়া।

নাসরিন আপার জন্য আলাদা একটা ঘর তৈরি করে দেওয়া হলো।

তাঁর চিকিৎসাও শুরু হলো।

চাঁদনির বিদায়ের দিনও ঠিক হলো—কিন্তু এবার কেউ তাকে বাধা দিল না।

সবাই জানত, সে নিজের জীবনের জন্য একটা পথ খুঁজে নিচ্ছে।

শেষ দৃশ্য – ছাদে বসে চাঁদের নিচে

আমি একা ছাদে উঠে বসলাম সেই আরাম চেয়ারে।

আকাশে সাদা চাঁদ–সেই চাঁদ, যেটা দেখতে আমি ছোটবেলায় এত উৎসুক ছিলাম।

টর্চটা আজও হারিয়ে গেছে,

কিন্তু আমি জানি, দাদার আলো আমার মধ্যে এখন জ্বলছে।

আমার মনে পড়ে সেই গান–

"চাঁদনি প্রসরে কে আমায় স্মরণ করে…"

আমরা সবাই কাউকে না কাউকে স্মরণ করি,

আর কেউ না কেউ আমাদের মনে রাখে।

চাঁদনি চলে গেছে আজ তিন দিন।

ঘরটা যেন খালি খালি লাগে।

বিছানার পাশে রাখা তার বইগুলো, খাতা, হেয়ার ব্রাশ — সবকিছু এখন নিস্তব্ধ স্মৃতির মতো।

আজ সকালে দরজার নিচে ঠাস করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো।

খুলে দেখি, একটা খাম।

লাল রঙের খামে হাতে লেখা– "তোর জন্য"

ভেতরে ছিল একটা চিঠি।

চিঠি থেকে কিছু অংশ

_“তুই হয়তো ভাবছিস, আমি চলে গেলাম বলেই সব শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু না… কিছু কিছু বিদায় আসলে শুরু হয়।

তুই তো জানিস, আমি মুখে কিছু বলতে পারি না। তাই লিখে যাচ্ছি।

এই বাড়ির ছাদ, চাঁদ, কাঠগোলাপ গাছ…

সবকিছু আমার মতোই তোকে ভালোবেসেছে।

তুই যেদিন দাদার টর্চ খুঁজতে বের হয়েছিলি, আমি তোকে আড়াল থেকে দেখছিলাম…

তোর ভাঙা মুখ, তোর কষ্ট আমি টের পেয়েছিলাম।

তুই ভেবেছিস আমি শুধু পড়াশোনার জন্য এখানে ছিলাম?

না রে বোকা, আমি তো তোকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম অনেক আগেই…

কিন্তু সাহস হয়নি বলতে।” _

আমার অবস্থা তখন…

চিঠির প্রতিটা শব্দ যেন আমার বুকের ভেতর ঢুকে গেল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি।

চাঁদনির মুখ, তার নিঃশব্দ হাসি, তার চোখে লুকানো প্রশ্ন—সবকিছু একসঙ্গে চোখে ভাসতে লাগল।

তারপর দেখি, চিঠির একদম নিচে লেখা—

“যদি একদিন তুই সাহস করে আমায় খুঁজতে আসিস, তাহলে গাছতলার সেই পুরোনো ঘরটায় আসিস–

যেখানে আমরা একবার লুকিয়ে গল্প পড়েছিলাম।

আমি জানি, তুই একদিন আসবি।

হয়তো শুধু আমার জন্য না, নিজের উত্তর খুঁজতে…

চাঁদনী”

শেষ লাইন

ঘড়ির কাঁটা যেন থেমে গেছে।

আমি জানি, এই চিঠি শুধু একটা ভালোবাসার কথা না–

এই চিঠি আমার ভেতরের ঘুমিয়ে থাকা মানুষটাকে জাগিয়ে দিল।

দাদার মৃত্যুর পর এই প্রথম মনে হলো, আমি আর একা নই।

আমি জানি, আমি যাব।

গাছতলার সেই পুরোনো ঘরে।

কারণ, কেউ একজন আমাকে এখনও “তুই” বলে ডাকে।

চাঁদনির চিঠির পর আমি আর বসে থাকতে পারিনি।

মনের মধ্যে একটাই কথা ঘুরছিল —

“পুরোনো সেই গাছতলার ঘরটা… ও কি সত্যিই থাকবে ওখানে?”

আমি বেরিয়ে পড়লাম, হাতে দাদার পুরোনো নোটবুকটা —

যেটা দাদার জিনিসপত্র ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম।

গাছতলার ঘরে পৌঁছানো

ঘরটা ঠিক আগের মতোই।

জীর্ণ, ধুলোমাখা, কিন্তু ভেতরে একটা অদ্ভুত উষ্ণতা।

চাঁদনি ছিল না।

কিন্তু ঘরের মাঝখানে রাখা ছিল আরেকটা চিঠি।

এই চিঠিটা আমাকে নয়, আমার দাদাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

চিঠির ভাষ্য

"আব্বা, আমি জানি আপনি খুব কষ্ট পেয়েছেন…

কিন্তু আপনি জানেন না, তালেব চাচা কেন তখন ওই জমিটা নিজের নামে লিখে নিয়েছিল।

সে আসলে চায়নি জমিটা আমাদের বাইরে চলে যাক।

দাদার এক বন্ধু, মোল্লা সাহেব, হুমকি দিয়েছিলেন জমি না দিলে মামলায় ফাঁসাবে।

তাই চাচা না বলে লিখে নেয়… আপনাদের জানালে হয়তো আপনারা মানতেন না।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

মানে, এতদিন যে মানুষটাকে লোভী ভেবেছি…

সে আসলে একটা ভয়কে আড়াল করতে চেয়েছিল?

দাদার নোটবুকের রহস্য

নোটবুকে দাদার হাতে লেখা ছিল একটি বাক্য:

“আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, দায়ী সময়।”

তারপর একটা কৌটা আঁকা ছিল–

ঘরের দেয়ালে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই একটা কৌটা পাথরের ফাঁকে লুকানো।

খুলে দেখি, পুরোনো একটা ক্যাসেট।

আমি জানতাম, বাড়ির নিচতলার সেই পুরোনো রেকর্ডারে হয়তো এটা শোনা যাবে।

দৌঁড়ে ফিরলাম বাড়িতে।

রাত তখন গভীর।

বাবা-মা ঘুমিয়ে।

রেকর্ডিংয়ের ভিতরের কণ্ঠ

“আমার প্রিয় সন্তান,

যদি কখনো এই ক্যাসেট শোন, তাহলে জেনে নিও–

এই বাড়ির প্রাণ তুমি,

আমার রেখে যাওয়া আলো টর্চে নয়, তোমার মনের মধ্যে জ্বলছে।

আমি চেয়েছিলাম, সব ভুলে সবাই একসঙ্গে থাকুক।

তুমি পারবে সেটা করতে।

চাঁদনিকে ধরে রাখিস।

আর মনে রেখো, যাদের আমরা ভুল বুঝি, তারা অনেক সময় আমাদের জন্যই নীরবে কাঁদে।

তাদের ক্ষমা করে দিস।”

আমি তালেব চাচার কাছে যাইনি বহুদিন।

তিনি থাকেন শহরের একপাশে ছোট্ট একটা দোতলা বাসায়, বেশ নির্জন।

বাড়ির গেট খোলার সময় আমার বুক ধকধক করছিল।

দাদার মৃত্যু, জমির কাগজ, পরিবারের অবিশ্বাস–সবকিছু এই মানুষটার নামের সাথে গাঁথা হয়ে আছে।

চাচার মুখোমুখি

চাচা দরজা খুলে অবাক হয়ে তাকালেন।

– “তুই? এতদিন পরে?”

আমি চুপচাপ চাচার দিকে এগিয়ে গেলাম, হাতে দাদার সেই চিঠি।

আমি শুধু বললাম,

"চাচা, আমি সব জেনে গেছি। আপনি যা করেছেন, আপনি খারাপ লোক না। আপনি আমাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।"

চাচার চোখে জল চলে এল।

– “আমি তো শুধু চেয়েছিলাম, মোল্লা সাহেবের মতো শকুনদের হাত থেকে জায়গাটা বাঁচাতে… কিন্তু কেউ বুঝল না।”

– “দাদা বুঝেছিলেন। তিনি তোমাকে ক্ষমা করে গিয়েছিলেন।”

চাচা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

– "আব্বা মারা যাওয়ার সময়ও আমি যেতে পারিনি… ভেবেছিলাম, মুখ দেখাব কী করে।"

আমরা দুজন নিঃশব্দে বসে থাকি।

অনেক বছর পর একটা ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগতে শুরু করে।

চাঁদনির খবর

চাচার কাছ থেকে ফেরার পথে ফোনে একটা মেসেজ এলো।

প্রেরক: চাঁদনি

"আজ সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে আসিস। আমি আসব।

কিন্তু এবার আমি প্রশ্ন করব না। শুধু শুনব…

তুই বলিস।"

চাঁদনির লেখা, খুব ছোট–কিন্তু এই কয়েকটা শব্দেই আমি যেন নিজের পুরো ভবিষ্যৎ দেখতে পেলাম।

আজ রাতে আবার সেই ছাদে দেখা হবে…

কিন্তু এবার আমি একা যাব না–আমার সাথে থাকবে

ক্ষমা, সত্য আর সাহস।

রাত ৮টা।

ছাদে উঠলাম নিঃশব্দে।

আকাশে আজও চাঁদ আছে, তবে তার আলো যেন কিছুটা উজ্জ্বল, কিছুটা ধীর।

হলুদ নয়, আজকের চাঁদ একেবারে সাদা।

যেমনটা আমার ম্যাম বলেছিলেন–যদি প্রতিদিন দেখো, একদিন দেখবে।

আর আজ, আমি দেখছি।

আর তখনই সিঁড়ির ধাপে হালকা শব্দ।

চাঁদনি।

সে ধীরে ধীরে ছাদে এল, হাতে একটা ছোট ব্যাগ।

সে কিছুটা পরিবর্তিত–অথচ চোখদুটো ঠিক আগের মতো।

আমরা মুখোমুখি বসে থাকলাম কিছুক্ষণ, কোন শব্দ নেই।

অবশেষে আমি বললাম:

– "চাঁদনি, আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, না জেনে, না বুঝে। কিন্তু এখন সব বলতে চাই… সব নতুন করে শুরু করতে চাই।"

সে কিছু বলল না। শুধু ব্যাগ থেকে একটি পুরোনো টর্চ বের করল।

আমার দাদার টর্চ!

আমি চমকে উঠলাম।

– "এইটা কোথায় পাইলা?"

– "সিঁড়ির কোণায় ছিল। ওইদিনের পর আমি প্রায়ই ছাদে আসতাম। মনে হচ্ছিল এইটা তোর জন্য রেখে যাওয়া কিছু।"

আমার চোখে জল চলে এলো।

আমি বললাম:

– "তুই থাকিস না কেন আবার আমাদের সাথে? বাড়িটা আবার প্রাণ ফিরে পাক…"

চাঁদনি চুপ করে ছিল। তারপর হালকা হাসি দিয়ে বলল:

– “তুই বললে, তো থাকতেই হবে…”

আমরা দুজনে তখন চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

গাছের পাতা দুলছিল, দূর থেকে কাঠগোলাপের গন্ধ আসছিল।

ভবিষ্যতের ভিতটা তৈরি হচ্ছিল নিঃশব্দে, আলো-অন্ধকারের মাঝখানে।

বিকেল পাঁচটা।

বাড়ির সামনে একটা অটোরিকশা এসে থামে।

চাঁদনি নামছে, সাথে দুটো ব্যাগ।

আমি নিচে দাঁড়িয়ে।

আমার মা, বাবা, এমনকি তালেব চাচাও আজ এসেছে দেখতে।

আমার মা বললেন,

– “তুই আবার ফিরলি, মেয়ে।”

চাঁদনি মৃদু হাসে, মাথা নিচু করে।

তালেব চাচা এগিয়ে গিয়ে তার ব্যাগটা হাতে তুলে নেন।

– “তুই আমার নিজের মেয়ের মতো। নতুন শুরু করতে পারবি।”

চাঁদনি প্রথমবারের মতো চাচার দিকে তাকিয়ে বলল,

– “ধন্যবাদ চাচা।”

পুরোনো ছাদে আবারও মিলন

রাতের আকাশে আজ চাঁদ নেই।

তবু আলো আছে–ভেতরের আলো।

আমরা ছাদে বসে আছি সবাই।

একসাথে।

দাদা নেই।

তবু মনে হচ্ছিল তিনি পাশে আছেন–

হয়তো সেই চেয়ারে, যেখানে তিনি বসতেন, চোখে মৃদু হাসি।

আমি আমার বোনের টর্চটি ফিরিয়ে দিয়ে দাদার টর্চটা নিজের ঘরে রেখে এলাম–একটা সাদা কাপড়ে জড়িয়ে।

এটুকুই বাকি ছিল দাদার থেকে।

স্মৃতির বাক্স খুলে ফেলা

দাদার সেই নোটবুক, সেই ক্যাসেট, সেই ছাদ, সেই কাঠগোলাপের গন্ধ…

সব একসাথে মিলে গিয়েছিল যেন।

আমরা সবাই ভুলে যেতে শুরু করলাম সেই কান্না, সেই ঝগড়া, সেই জমির খণ্ড।

আমরা শুধু মনে রাখলাম–

"একটা পরিবারের আসল জিনিস জমি নয়, টর্চ নয়–ভালোবাসা।"

শেষ পৃষ্ঠা

রাত ১১টা।

আমার ঘরে বসে আমি শেষবারের মতো দাদার কথাগুলো মনে করলাম:

“আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, দায়ী সময়।”

“তুমি পারবে, সবাইকে এক করে তুলতে।”

আমি জানি, আমি পেরেছি।

আমার বাড়ি এখন আবার “বাড়ি” হয়ে উঠেছে।

ভোরে উঠে সবাইকে ডেকে ছাদে উঠতে বলব।

চাঁদ উঠবে কিনা জানি না,

তবে আলো থাকবে, কারণ এবার আমরা কেউ আর অন্ধকারে হারিয়ে যাব না।